‘আপনি আচরি ধর্ম তা শিখাইয়ো অপরে’

চিররঞ্জন সরকার

বিগত জোট সরকার দলবাজ ব্যক্তিদের প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে এমনকি বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থার বারোটা বাজিয়ে গেছে। এখন আমরা এই বারোটা বাজার সঙ্কেত-ধ্বনি প্রতিনিয়ত শুনতে পাচ্ছি। প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, আইন, আইনের শাসন সব কিছুই কেমন প্রশ্ন বিদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে উচ্চ আদালতে সম্প্রতি সংঘটিত বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। এমনিতেই আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে নানা কারণে সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসটা খুব একটা দৃঢ় নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রশাসন, বিচার ব্যস্থাসহ সব কিছুর অবাধ দলীয়করণ হয়েছে। এব্যাপারে সদ্য বিদায়ী জোট সরকার আপোষহীন ভূমিকা পালন করেছে। জোট সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা আইন, বিচার, সবকিছুকেই ‘একান্ত আপন’ করে নিয়েছিলেন। বিচার, আইন, বিচারক সবকিছুরই তারা চালকে পরিণত হয়েছিলেন। এই অবস্থা এখনো আব্যাহত আছে।

আমাদের দেশে আইন সব সময়ই ক্ষমতাবানের পক্ষে। ‘আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে’– এই আপ্ত বাক্যের কোনো ভিত্তি আমাদের দেশে বড় বেশি খুঁজে পাওয়া যায় নি। আসলে আইন কখনোই তার নিজস্ব গতিতে চলে না। কারণ আইন নিজে ‘চলতে’ পারে না। আইনকে ‘চালাতে’ হয়। আইনকে ‘চালান’ একদল আইনের মানুষ। এই আইনের মানুষরা আবার অনেক ক্ষেত্রে পরিচালিত হন যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের দ্বারা। ফলে আমাদের দেশের আইন ‘নিজে চলার’ চাইতে ‘চালানোর’ ওপরই নির্ভরশীল বেশি।

যে নিজে ‘চলতে’ পারে না, যাকে ‘চালাতে’ হয়, সে ‘কর্তার’ ইচ্ছেয় ‘কর্ম’ করবে, এটাই স্বাভাবিক। আর কর্তার ‘ইচ্ছে’কে যে পরিবর্তন করা সম্ভব একথা কে না জানে? ‘তুষ্ট’ করতে পারলে ঈশ্বরও ভক্তের অনুকূলেই ‘রায়’ দেন। কাজেই আইন নিজ গতিতে আপন নিয়মে সুষ্ঠুভাবে কখনোই চলে না। বাংলাদেশের মতো ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও লোভের ‘দেবতার দেশে’ তো নয়ই। কবির ভাষায়– এখানে বিচারের বাণী নীরবে নির্ভতে কাঁদে। এখানে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের আভাবই শুধু দেখা যায় না, একই আইনের প্রয়োগ একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম হতেও দেখা যায়। কখনোবা সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কারণও অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রতীচ্য ধারণা অনুযায়ী আইনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্ধ। তার চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা। যদিও তার হাতে তুলাদণ্ড রয়েছে, কিন্তু দেবীর চোখ বাঁধা বলে নিজের অসমতা অনেক সময় দেখতে পারেন না।

আমাদের দেশে আইনের দেবীকে অন্ধ করে রাখা হয়েছে। আর এই ‘অন্ধ’ দেবীকেই আমরা যুগ যুগ ধরে অন্ধভাবে পূজা করে এসেছি। কিন্তু এই দেবীর বিচার বা বিবেচনার প্রসাদ পেয়ে সবাই সমানভাবে তুষ্ট হতে পারিনি। ইদানীং এ দেবী সম্পর্কে ‘পক্ষপাত’ ও ‘দলবাজি’র অভিযোগও জোরে-শোরেই উচ্চারিত হচ্ছে। মনে মনে তাই অনেকেই এই দেবীর প্রতি বিরূপ। কিন্তু দেবীর ‘কোপানলে’ পড়ার ভয়ে তা কেউ প্রকাশও করতে পারেন না। ‘দেবীর’ অবশ্য এটা বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। তার মানে, আইনের ‘অন্ধ দেবী’র সঙ্গে আমাদের একটা দূরত্ব কিন্তু রয়েছেই। দেবীর চোখের ‘কালো কাপড়টা’ না খোলা পর্যন্ত আসলে এ বিরোধ মিমাংসার কোনো সহজ পথ নেই। আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে, দেবী ‘অন্ধভাবে’ নয়, বরং ‘চোখ মেলে’সব দেখুক। কালো পর্দা সরে যাক, দেবী দেখবার স্বাধীনতা অর্জন করুক। দেখে-শুনে-বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক। আমরাও দেবীর চোখ দুটিকে দেখি। প্রয়োজনে চোখে চোখ রেখে কথা বলি।

অবশ্য আইন-আদালত-বিচারপতি এসব নিয়ে কোনো রকম আলোচনা বা মন্তব্য করাটা অত্যন্ত ঝঁকিপূর্ণ। বিষয়টি জটিল, স্পর্শকাতর এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকরও বটে। সুলেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নিজে বিচারক ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ছোট আদালত মানে হচ্ছে ছোটা এবং ছোটা। ছুটতে ছুটতে কালো ঘাম বেরিয়ে যাবে। তা সেই ছোট আদালতের পরে সেজ, মেজ কতো আদালত, বড় আদালতে পৌছে মামলার নিস্পত্তি হতে হতে একটা জীবন বরবাদ হয়ে যায়। মামলার ঘারে মামলা, আপিলের পিঠে আপিল। একবার এ-পক্ষ জেতে, ও-পক্ষ জেতে আরেকবার। ততোদিন সর্বনাশ হয়ে যায়– অর্থনাশ, কর্মনাশ, ধর্মনাশ। এসব কথা অবশ্য আমরা সবাই জানি। আমরা আরো জানি যে মামলা করে কোনো লাভ হয় না। উত্তেজনা বাড়ে, রক্তচাপ বাড়ে, রক্তে শর্করা বাড়ে, হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়। এদিকে টাকা-পয়সা, ধনদৌলত, বাড়ি-জমি সব যায় মামলার গহ্বরে। গ্রামে-গঞ্জে এখনো কেউ কারো ওপরে ক্রুদ্ধ হলে অভিসম্পাত করেন– ‘তোর ঘরে যেন মামলা ঢোকে।’ ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, এর চাইতে বড় অভিশাপ হয় না। তারপরও অবশ্য মামলা থেমে নেই। রাস্তাঘাটে যানজট, শিক্ষাকেন্দ্রে সেশনজটের চাইতে আদালতে মামলাজট এখনো অনেক বেশি।

* * * * *

আমাদের দেশে বর্তমানে অচিন্তনীয় ও নজিরবিহীন সব ঘটনা ঘটছে। পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে যে সব ঘটনার কথা কল্পনা করা যায় না তেমন ঘটনা আমাদের দেশে অবাধে ঘটছে। নিয়ম-নীতিকে অগ্রাহ্য করে দেশের প্রধান বিচারপতি রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে বিচার কাজে বাধা দেয়া বা বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত

করার ঘটনা পৃথিবীর কোথাও কখনো ঘটেছে বলে জানা যায় না। অথচ আমাদের দেশে তেমন ঘটনাও ঘটেছে। ন্যায় বিচার না পেয়ে উচ্চ আদালতের আইনজীবীদের নেতৃত্বে প্রধান বিচারপতির কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনাই বা কবে কোথায় ঘটেছে? নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতে দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বিচারপতিদের এক জোট হয়ে সর্বোচ্চ আদালতে ধর্মঘট পালনের ঘটনাই বা কবে কোথায় ঘটেছে? আদালতে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলায় দেশের প্রবীন ও সম্মানীত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনার ঘটনাই কী পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কখনো ঘটেছে?

হ্যাঁ, পৃথিবীর অন্য কোথাও অন্য কোনো দেশে না ঘটলেও আমাদের এই 'সব সম্ভবের দেশে' এমন আজব সব ঘটনাই ঘটেছে। তবু ভালো 'জনগণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে' বিচারকরা শেষপর্যন্ত আদালত বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। তারা যদি আদালতের কাজ স্থায়ী ভিত্তিতে বন্ধ করে দিতেন তাহলেই বা জনগণের কী করার ছিল? বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের এক সন্ধিক্ষণে সুপ্রিম কোর্টে এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে একটি অশনিসংকেত। বাংলাদেশে তো নয়ই, বিশ্বের ইতিহাসে এর আগে কবে কোথায় উচ্চ আদালতের সব বিচারক ধর্মঘট পালন করেছেন, তা জানা যায় না। বিচারকরা আদালত বর্জনের যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন এর সিদ্ধান্তও ফুল কোর্টে নয়, প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে. আর. মোদাচ্ছির হোসেনের বাসভবনে আপিল বিভাগের ছয় বিচারক সমন্বয়ে নেয়া হয়েছিল। পরদিন ওই সিদ্ধান্তই হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকেরা অনুমোদন করেন। উচ্চ আদালতে সংঘটিত এসব অনাকাঙ্ক্ষিত অবিশ্বাস্য ঘটনায় আইনের শাসনের কার্যকারিতা এবং উচ্চ আদালতের মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও পবিত্রতা গুরুতরভাবে ম্লান হয়েছে।

উচ্চ আদালতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এর জন্য কে বা কারা দায়ী তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। বিএনপি-জামায়াত জোট সমর্থক আইনজীবী ও বিচারকরা একযোগে সমবেত কণ্ঠে সুপ্রিম কোর্টের ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থক আইনজীবীদের দায়ী করছেন। সব দায় তাদের ওপর চাপিয়ে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়কে তারা তিন দিনের জন্য অচল করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আদালত প্রাঙ্গনে হামলা ও ভাঙ্গচুরের ঘটনা কেন ঘটলো? প্রধান বিচারপতি যদি সেদিন একটি বেঞ্চের বিচারকাজে ওমন নজিরবিহীন অনৈতিক হস্তক্ষেপ না করতেন তাহলে কী এমন ঘটনা ঘটত? এই হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কি সুপ্রিমকোর্টের মান-মর্যাদা ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে এটাকে একটা বারোয়ারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়নি?

সুপ্রিম কোর্টে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রেক্ষাপট আমরা সবাই জানি। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেয়াকে অবৈধ ঘোষণা ও তিনি কোন কর্তৃত্ববলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়েছেন তার ব্যাখ্যা চেয়ে হাইকোর্টে দায়ের করা রিট মামলাগুলোর আবেদন শুনানি শেষে রায় দেয়ার আগমুহূর্তে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির মামলাগুলোর কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছেন। এই স্থগিতাদেশের মাধ্যমে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে টুটি টিপে হত্যা করা হয়েছে এবং বিএনপির ভাবমূর্তি রক্ষার জন্যই মামলাগুলোর বিচারকাজে অন্তিম মুহূর্তে বাধা দিয়ে এক কলঙ্কিত ইতিহাস তৈরি করা হয়েছে বলে আইনজীবীরা মন্তব্য করেছেন। মূলত প্রধান বিচারপতির এই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকাতেই যে উচ্চ আদালতে হামলা ও ভাঙচুরের মতো নিন্দনীয় ঘটনাও ঘটেছে একথা অস্বীকার করা যাবে কী?

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির অভিযোগ, প্রধান বিচারপতি বিএনপি-জামায়াত জোটের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে যাবতীয় সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ মানুষও কিন্তু এমনটাই মনে করছেন। সাধারণ মানুষ দেখেছে যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ নিয়ে দেশে সাংবিধানিক সঙ্কট চলছে সে সময় দেশের প্রধান প্রধান প্রায় সব রাজনৈতিক দল এ সংক্রান্ত তিনটি রিট আবেদন দাখিল করে। আদেশ প্রদানের পূর্বমুহূর্তে এই মামলাগুলো স্থগিত করে সঙ্কট নিরসনের অধিকার থেকে নাগরিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। পরে যখন তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা সঙ্কট সমাধানের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছিলেন সে সময় ৪ দলীয় জোট আয়োজিত পল্টনের এক জনসভায় বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমাদ রিট মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারির দাবি জানান। এ দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আদালতের বিচার কাজ বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন। ৪ দলীয় জোটের এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রধান বিচারপতি নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। প্রধান বিচারপতিসহ অন্য বিচারপতিরা এখন দেশের নয়, দলের বিচারপতি হিসেবে নাম লিখিয়েছেন– এমন মন্তব্যও শোনা যাচ্ছে (প্রথম আলো, ৭ ডিসেম্বর, ২০০৬)। এমন মন্তব্যের যৌক্তিকতাও রয়েছে। গত কয়েক দিনে বিচারকদের বক্তব্যের সঙ্গে বিএনপি-জামায়াত নেতাদের বক্তব্যের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো, ওই দিন সুপ্রিম কোর্টে সংঘটিত ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগের দৃশ্যমান হামলাগুলো মিডিয়ায় এসেছে; কিন্তু সংবিধান এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে যে অদৃশ্যে গলা টিপে হত্যা করা হলো সেই হামলার কথা বিচাপতিরা একবারও বলছেন না। তারা দলবাজি করবেন, সংবিধানের রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন, বিচার

ব্যবস্থাকে তামাশায় পরিণত করবেন আর প্রতিকার না পাওয়া ভুক্তভোগী মানুষ তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে যাবেন, বাহবা দিয়ে চলবেন তাই কী হয় কখনো? না তাই হওয়া উচিত? সবাই কী আর বিবেকহীন অক্ষম ভাঁড় হতে পারে?

উচ্চ আদালতের বিচারকরা নিজেদের দেয়া রায়ও নিজেরা ভঙ্গ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের যে কোনো আদালত অঙ্গনে আন্দোলন নিষিদ্ধ করে গত বছর ২৩ মে সুয়োমটো রুল জারি করেন। এই রুলের সঙ্গে আদালত বর্জন, বয়কট বা ধর্মঘটের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন এবং বিচারপতি এ এফ এম আবদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এক স্বপ্রণোদিত আদেশে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কোনো প্রচারপত্র, ব্যানার, তৈরি করা বা টাঙানো, এর সপক্ষে কোনো বিবৃতি দেয়া বা তা সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ এবং প্রচার করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

একজন বিচারপতির এলএলবি সার্টিফিকেটকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেয়া হাইকোর্টের স্বপ্রণোদিত আদেশটিতে বলা হয়, এ নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ আদেশে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা কারো আপত্তি থাকলে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে তিনি আবেদন করতে পারবেন। এ ধরনের কোনো আবেদন পাওয়া গেলে অ্যাটর্নি জেনারেলকে আদেশের পক্ষ অবলম্বন করে আদালতে শুনানির নির্দেশ দেয়া হয়। এ ছাড়াও আদালতকে সমর্থন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের চারজন সিনিয়র আইনজীবীকে নিয়ে একটি এমিকাস-কিউরে প্যানেল তৈরি করা হয়। এই প্যানেলে আদালত যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন তারা হলেন ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, মাহমুদুল ইসলাম ও আজমালুল হোসেন কিউসি। আদেশটি এখনো বহাল আছে । অথচ খোদ বিচারপতিরা এখন নিজেদের আদেশ লঙ্ঘন করে পর পর তিন দিন আদালত বর্জন করলেন। আইনের রক্ষকরাই যদি আইন ভঙ্গ করেন, তাহলে আইনকে সমুন্নত রাখবে কে? বিচারপতির বিচারই বা কে করবে? অন্যের অপরাধের বিচার করাই একজন বিচারকের কাজ। কিন্তু বিচারকের বিরুদ্ধেই যদি অভিযোগ ওঠে তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে?

'জনগণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে' শেষপর্যন্ত বিচারপতিরা তাদের আদালত বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন বলে জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো জনগণ যে তিনদিন তাদের বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো তার কী হবে? যারা জনগণকে সংবিধানসিদ্ধ অধিকার থেকে তিন দিন বঞ্চিত করলো তাদের বিচার কে করবে?

ঢাকা থেকে, ৯ ডিসেম্বর ২০০৬